তারিখ ... 12 AUG 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক জনকণ্ঠ

পরীক্ষার ফল ও অন্যান্য

মিলু শামস

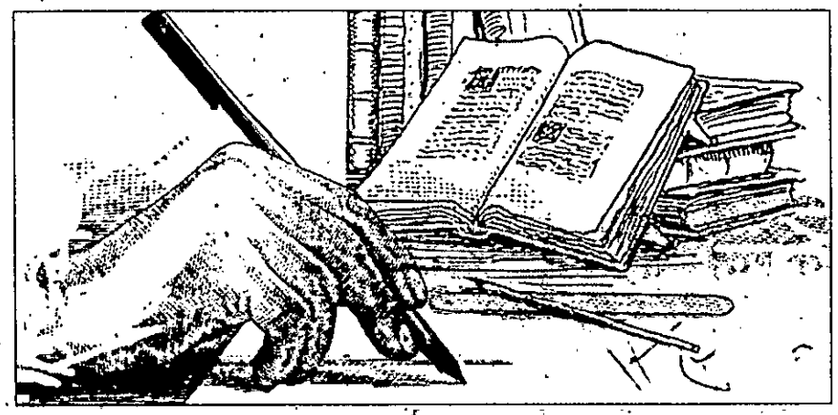

সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালুর পর এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ধারাবাহিকভাবে বাড়লেও সদ্য প্রকাশিত এইচএসসি পরীক্ষার ফল হোঁচট খেয়েছে। শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা এজন্য ছটি কারণ চিহ্নিত করেছেন- এক. প্রশ্নের ধরন পরিবর্তন দুই. অন্য বোর্ডের প্রশ্নে পরীক্ষা দেয়া তিন. প্রশ্ন ফাঁসের গুজব চার. রাজনৈতিক অস্থিরতা পাঁচ. নতুন বিষয় বাধ্যতামূলক করা ছয়. ইংরেজি ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে বেশি অকৃতকার্য হওয়া। তারা এ বিষয়ে সরকারের শিক্ষা বিষয়ক সংশ্লিষ্টদের দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের একজন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আরও একটি কারণ চিহ্নিত করে বলেছেন, আগে নিজ নিজ বোর্ড প্রশ্নপত্র তৈরি করতো, এ বছর থেকে নিজ বোর্ড বাদ দিয়ে বাকি সাত বোর্ডের আটাশ সেট প্রশ্নপত্র থেকে যেকোন চার সেট পছন্দ করা হয়েছে। আগে শিক্ষার্থীরা সিলেক্টিভ পদ্ধতি অনুসরণ করে পড়তো, পুরো বই পড়তো না। এখন ভিন্ন একটি বোর্ডের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে, যে জন্য শিক্ষার্থীরা ভাল ফল করতে পারেনি।

শিক্ষা নিয়ে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষায় যে ক্ষতি হয় তাতে শুধু শিক্ষার্থীদের নয়, ক্ষতি হয় পুরো দেশের। কারণ এখন যারা শিক্ষার্থী তাদের হাতেই ভবিষ্যতে দেশের ভার।

গত বছর এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় সারাদেশে উত্তীর্ণ হয়েছিল আট লাখ পঁচাশি হাজার সত্তর জন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বারোটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর জরিপ শেষে জানিয়েছিল, উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন করার যোগ্যতা আছে প্রায় সাড়ে ছয় লাখ শিক্ষার্থীর। সে সময় উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্পের এক সমীক্ষায় জানানো হয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছুদের মধ্যে কোচিং করেছে শতকরা তিরানব্বই ভাগ শিক্ষার্থী। তাদের হিসাব মতে, সে বছর ছয় লাখ চার হাজার পাঁচ শ' শিক্ষার্থী ভর্তি কোচিং করেছে। কোচিংয়ের জন্য শিক্ষার্থীপ্রতি খরচ হয়েছে তেতাল্লিশ হাজার আটানব্বই টাকা, সে হিসেবে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোচিং সেন্টারগুলো আদায় করেছে প্রায় দুই হাজার ছয় শ' পাঁচ কোটি টাকা। গত বছর শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল প্রায় তিন লাখ এক হাজার এক শ' আটত্রিশ শিক্ষার্থী। এদের কোচিং ব্যয় এক হাজার দুই শ' ছয় কোটি টাকা। এত খরচের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল শতকরা মাত্র একুশ ভাগ শিক্ষার্থী।

মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্য প্রয়োজন ক্লাসে সঠিক শিক্ষা দেয়া। সে জন্য প্রয়োজন যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষক। কিন্তু শিক্ষকদের জন্য যে বেতন স্কেল নির্ধারণ করা আছে তা মেধাবীদের এ পেশায় আকৃষ্ট করে না। যাঁরা আসছেন তাঁরা বেতনের ওপর নির্ভর করে চলতে পারেন না। কিন্তু যেভাবে এর বিস্তার অপ্রতিরোধ্য গতিতে বাড়ছে তাতে শুধু অভিভাবকরা বিপর্যস্ত হচ্ছেন না শিক্ষার ভিতই অন্তঃসারশূন্য হচ্ছে। নম্বরভিত্তিক প্রতিযোগিতার ফলে কোচিং সেন্টার নির্দিষ্ট ছকে ফেলে শিক্ষার্থীকে পর্যাপ্ত নম্বর পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে; কিন্তু মেধা ও সৃজনশীলতার পুরো বিষয়ই উপেক্ষিত থাকছে। তারা শিক্ষক পাচ্ছে না, ভাল ফল করার গাইড পাচ্ছে। যাঁরা কিছু কৌশল রপ্ত করাচ্ছেন যা দিয়ে শিক্ষার্থী পুরো শিক্ষা জীবনের বৈতরণী পার হয়ে আসছে। কিন্তু একজন সঠিক মানুষ হওয়ার কলাকৌশল সে কতটা রপ্ত করল, তা যাচাইয়ের সুযোগ কমতে কমতে প্রায় শূন্যে ঠেকেছে। এত বেশি প্রতিযোগিতা এত বেশি পরীক্ষা একেবারে জীবনের শুরু থেকে এর প্রয়োজন কতটা আছে তাও প্রশ্নহীন নয়। এই যে পাসের এত ছড়াছড়ি এত জিপিএ ফাইভ। শেষ পর্যন্ত এর গন্তব্য কোথায় কে জানে। প্রতিযোগিতাকে একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ায় বছর বছর একগুচ্ছ কচিমুখে তথাকথিত সাফল্যের হাসি দেখছি আমরা; এর পেছনেও রয়েছে কোচিং সেন্টার।

একদিকে শিক্ষা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট অন্যদিকে কোচিং পদ্ধতি এই দুইয়ের সমন্বয়ে শিক্ষার গতিমুখ কোন্ দিকে যাচ্ছে, তা শিক্ষা মনোবিদরাই ভাল বলতে পারবেন।

সরকারী ও বেসরকারী এমপিওভুক্ত স্কুল শিক্ষকদের ক্লাসের বাইরে কোচিংয়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট রুল জারি করেছিল সে বছর অক্টোবরে। এ বিষয়ে সরকারকে প্রজ্ঞাপন জারির নির্দেশ কেন দেয়া হবে না জানতে চেয়েছিল। চার সপ্তাহের মধ্যে সরকারের পক্ষে শিক্ষা সচিবসহ কয়েকজন সচিব এবং শিক্ষকদের পক্ষে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের চেয়ারম্যান এবং ঢাকার প্রথমসারির কয়েকটি স্কুল কর্তৃপক্ষসহ বিশ জনকে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছিল। অভিভাবক ঐক্য ফোরামের সভাপতির রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে এ রুল জারি হয়েছিল। সে সময় হাইকোর্টের আদেশকে স্বাগত জানিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। বলেছিলেন, আমরাও এর পক্ষে। আমরা চাই দেশ থেকে কোচিং ব্যবস্থা উঠিয়ে দিতে। নির্ধারিত সময়ে রুলের জবাব দিতে অক্ষমতা জানিয়ে আদালত থেকে সময় নিয়েছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। রুলে যাঁদের জবাব দিতে বলা হয়েছে তাঁদের নিয়ে বৈঠক করে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, সরকার কোচিং বাণিজ্যে জড়িত শিক্ষকদের তালিকা করছে। যে শিক্ষকরা ক্লাসের বাইরে কোচিং করাচ্ছেন তাঁদের তালিকা করে কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করা হবে। কোচিং বন্ধে সরকার শুরু থেকেই কঠোর অবস্থানে রয়েছে। দ্রুত এ সমস্যা সমাধান সম্ভব নয় বলে দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া শুরু করেছে। ক্লাসরুমে পূর্ণ শিক্ষা পেলে শিক্ষার্থীরা কোচিংয়ে যাবে না। আর ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান কোচিংয়ের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করে সরকারী স্কুল কলেজের যে শিক্ষকরা কোচিংয়ে জড়িত তাঁদের বদলি করতে বলেছেন। আর বেসরকারী বিদ্যালয়ের কোচিংয়ে যুক্ত শিক্ষকদের নিয়ে কী করা যায়, সে বিষয়ে গঠিত কমিটি সুপারিশমালা তৈরি করবে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা ১৯৭৯-এর মতের বিধি অনুযায়ী কোন সরকারী কর্মচারী সরকারের অনুমতি ছাড়া অন্য কোন ব্যবসায় জড়িত হতে পারবেন না। কোন সরকারী কর্মচারী এর ব্যত্যয় ঘটালে আচরণ বিধিমালা লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত হবেন। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর থেকে বেসরকারী শিক্ষকদের কোচিং বন্ধে আইন করার প্রস্তাব করেছে।

শিক্ষকদের যুগোপযোগী বেতন স্কেল ও সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিতের পাশাপাশি কোচিংয়ের জন্য অভিভাবকদের নিরুৎসাহিত করার কথা বলেছে। কোচিং নির্ভরশীলতা কমিয়ে ক্লাসেই প্রয়োজনীয় শিক্ষা নিশ্চিত করতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত কমপক্ষে ১ : ৩০ করাসহ স্কুলে পরীক্ষায় ফল খারাপ হলে শ্রেণীশিক্ষককে জবাবদিহির আওতায় আনার কথাও বলেছে। এ সব প্রস্তাবের পাশাপাশি যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টিও নিশ্চিত করা অন্যতম জরুরী। একজন ভাল শিক্ষকের প্রভাব যেমন আজীবন রয়ে যায় খারাপ শিক্ষকের নেতিবাচক প্রভাবও তেমনি। অযোগ্য শিক্ষক যে ক্ষতি করে তার মাসুল দিতে গোটা জীবনই চলে যায়।

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক তাঁর এক লেখায় বলেছিলেন, 'এটা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাতে সম্ভব যে দেশের একজন নাগরিক প্রাথমিক শিক্ষায় ঢুকে উচ্চশিক্ষার ভিতর দিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে বেরিয়ে আসতে পারেন, শিক্ষা বস্তুটি দ্বারা এতটুকু স্পর্শিত না হয়ে। মানুষকে এমন চরম অপদার্থ ও অকর্মণ্য বানাবার কারখানা দুনিয়ার আর কোথায় আছে বলে আমার জানা নেই।' এ কারখানার গোড়াপত্তন করে গেছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা, যার উত্তরাধিকার আমরা আজও বইছি। শাসন শোষণের সুবিধার জন্য কৃত্রিম আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা সৃষ্টির পাশাপাশি গড়ে তুলেছিল কৃত্রিম শিক্ষা ব্যবস্থা। ক্ষমতার ভিত মজবুত করতে এত আয়োজন করলেও শেষ রক্ষা হয়নি। ভারত ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল তারা। তবে নানা ক্ষেত্রে আমাদের এখনও কলোনিয়াল হ্যাংওভার রয়ে গেছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় আজও মৌলিক পরিবর্তন আসেনি। বরং স্বাধীনতার পর নিয়মতান্ত্রিক সরকারের পথরোধ হওয়া ও সামরিক শাসনের আধিপত্য শিক্ষার গতিমুখকে কেবল নিচের দিকেই টেনেছে। এ অবস্থা বদলাতে শক্ত মেরুদণ্ড নিয়ে দাঁড়াতে হবে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে। পরিমাণগত পরিসংখ্যানের চেয়ে গুণগত পরিসংখ্যানকে গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যও অনেক। গ্রাম-শহরের বৈষম্য, মাদ্রাসা, ইংরেজী মাধ্যম, বাংলা মাধ্যম, ক্যাডেট কলেজ ইত্যাদির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-বৈষম্য নিয়ে চলছে শিক্ষার প্রক্রিয়া। এত অসঙ্গতি নিয়ে একটি স্বাভাবিক শিক্ষা ব্যবস্থা এগোতে পারে না। কোচিংবাণিজ্য ভর্তিবাণিজ্য ইত্যাদি এর অনিবার্য উপসর্গ। শিক্ষা ব্যবস্থার মূলে গলদ জিইয়ে রেখে কোচিংবাণিজ্য দূর করা সম্ভব নয়। কোন না কোনভাবে তা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবেই। পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি সমন্বিত নীতিমালার মধ্যে এনে অনিয়মের জটগুলো একে একে খুলতে হবে। নইলে কোন সমস্যারই স্থায়ী সমাধান সম্ভব হবে না।

শিক্ষা নিয়ে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষায় যে ক্ষতি হয় তাতে শুধু শিক্ষার্থীদের নয়, ক্ষতি হয় পুরো দেশের। কারণ এখন যারা শিক্ষার্থী তাদের হাতেই ভবিষ্যতে দেশের ভার